ধারাবাহিক রচনা

দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রভাব

সুমনা সাহা

তামিল সাহিত্য

আধুনিক তামিল সাহিত্যে 'ভোরের শুকতারা' নামে প্রখ্যাত সুব্রহ্মণ্য ভারতী (১৮৮২-১৯২১) ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, দেশপ্রেমিক এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের একনিষ্ঠ অনুরাগী। সর্বজনবোধ্য সরল মধুর ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী রচনা করে স্ব-সম্পাদিত একটি তামিল পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তিনি প্রকাশ করতেন। রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয় কিংবা অন্য যে-কোনও বিষয়ে লিখিত সকল রচনাতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও গল্প-উপমার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের ভিত্তিতে তিনি তামিল ভাষায় পতঞ্জলি যোগসূত্রের একটি বিশদ ভাষ্য রচনা করেন।

এই অনুভবী কবির মন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে কতদূর প্রভাবিত হয়েছিল, তা তাঁর উচ্ছ্বসিত মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায় : ''এমন কোনও বিষয় নেই যা নিয়ে স্বামীজী ভাবেননি। এমন কোনও শাস্ত্র নেই যা স্বামীজীর অপঠিত। তাঁর জ্ঞানের ভূমি অপ্রতিহত। তাঁর শৌর্য অপ্রতিম। গীতাচার্য শ্রীকৃষ্ণের পর একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই সহজবোধ্য ভাষায় হিন্দুধর্মের প্রকৃত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দুধর্মে বিপ্লব এনেছেন তিনি।''

সুব্রহ্মণ্য ভারতীর জন্ম ১১ ডিসেম্বর ১৮৮২, তামিলনাড়ুর তুতুকুডি জেলার এট্টায়াপুরমে। কবি পরিবার। বাবা স্বপ্ন দেখেছিলেন ছেলে ইংরেজি শিক্ষিত বড় অফিসার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্তু পড়াশোনায় ভারতীর মন ছিল না। তামিল সাহিত্যে সুপণ্ডিত মাতামহর সঙ্গে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। স্কুলের সহপাঠী, পরবর্তী কালে বিখ্যাত পণ্ডিত এস সোমসুন্দর বলেন, ''বাবার মুখে ওর কাব্যপ্রতিভার প্রচুর প্রশংসা শুনেছি। আট বছর মাত্র বয়স হবে, তখন থেকেই যে-কোনও রচনার অংশ তাকে দেওয়া হলে তার উপর অসাধারণ শ্লোক রচনা করে দিত। নামকরা শ্লোক-রচয়িতারাও বালকের ওই প্রতিভা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতেন।'' ১৮৯৩ সাল। যে-বছর স্বামীজী

আমেরিকায় হিন্দুধর্ম ও ভারতের গৌরব প্রচার করলেন, সে-বছরই এক কবিসম্মেলনে এগারো বছরের সুব্রহ্মণ্য কাব্যপ্রতিভার নিরিখে এট্টায়াপুরমের রাজার কাছ থেকে 'ভারতী' খেতাব অর্জন করলেন।

তাৎক্ষণিক শ্লোক রচনা করে ছাত্রমহলে হইচই ফেলে দেওয়া ভারতী বন্ধুদের কাছে নায়কোচিত সম্মান লাভ করলেও বাবা মোটেই খুশি ছিলেন না ছেলের মতিগতিতে। তিরুনেলভেলি শহরে ছেলেকে উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন, কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার সিলেকশন টেস্টে তিনি অকৃতকার্য হলেন। ১৮৯৭ সালে প্রথা অনুসারে চোদ্দো বছরের ভারতীর বিবাহ হয়ে গেল। কয়েক মাসের মধ্যে পিতার মৃত্যুতে সংসারের পরিস্থিতি আগের মতো রইল না, ভারতী বেনারস গেলেন হিন্দু কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে। ম্যাট্রিক পাশ করে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হলেন। বেনারসে চার বছর বসবাসের ফলস্বরূপ সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ হল।

১৯০২-তে এট্টায়াপুরমের রাজার অনুরোধে ভারতী রাজার সভাকবি হয়ে ফিরে এলেন। এই কালের প্রচুর অবসর তিনি কাজে লাগালেন পুরাণ, উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতির অধ্যয়নে। কিন্তু সভাকবির পদ তাঁর বেশিদিন ভাল লাগল না, পরের বছরই ওই পদ তিনি ত্যাগ করলেন। মাদুরাই থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা 'বিবেকভানু'-তে এই সময় তাঁর লেখা একটি কবিতা প্রথম মুদ্রিত অক্ষরে সাহিত্যরসিকের অঙ্গনে এল। ১৯০৪ সালে মাত্র একুশ বছর বয়সে মাদুরাই-এর সেতুপতি কলেজে তিনি তামিল ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। মাদুরাই এসে গোপালকৃষ্ণ আয়ার নামে এক মহৎ-হৃদয় ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাম্বান বন্দরে অবতরণ করেন, তখন রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে তিনিও ছিলেন স্বামীজীর অভ্যর্থনায়। তিনি তখন স্থানীয় একটি কলেজে তামিল ভাষার অধ্যাপক। স্বামীজীর 'সন্ন্যাসীর গীতি' কবিতাটি এই পণ্ডিত-কবি তামিলে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। এঁর সঙ্গে হৃদ্যতার সূত্রে ভারতী শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী সম্বন্ধে গভীরভাবে জানার সুযোগ পেলেন। ভারতী যতদিন মাদুরাইতে ছিলেন, ততদিন শ্রীআয়ার তাঁর বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী হয়ে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। ভারতী অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিতে চাইলে গোপালকৃষ্ণ তাঁকে জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, যিনি তখন বিখ্যাত তামিল দৈনিক 'স্বদেশমিত্রম্'-এর সম্পাদক। ইনি ছিলেন স্বামীজীর পরিব্রাজনকালের শিষ্য। মাদ্রাজের পাচায়াপ্পা কলেজ হলে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ স্বামীজী 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ' বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার সেদিন সেই বক্তৃতামঞ্চে আসন লাভ-করা ভাগ্যবানদের অন্যতম ছিলেন। তিনি 'স্বদেশমিত্রম্'-এর সহ সম্পাদকের পদগ্রহণের জন্য সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে আমন্ত্রণ জানালেন। ট্রিপ্লিকেন লিটারারি সোসাইটি ও মাদ্রাজ সোশ্যাল রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন—এই দুই সংস্থারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন আয়ার। স্বামীজী যখন এক অপরিচিত সন্ন্যাসী, তখন এই দ্বিতীয় সংস্থাটির উৎসাহে ও উদ্যোগেই শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা প্রচার করেন। তিনি যখন পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত বিখ্যাত সন্ন্যাসী, তখনও এই সংস্থাই তাঁর বেদান্ত বক্তৃতার আয়োজন করে। সুব্রহ্মণ্য আয়ারের মাধ্যমে সুব্রহ্মণ্য ভারতী ক্রমে স্বামীজীর অনুরাগী-ভক্তদের সংস্পর্শে এলেন। এঁরা ছিলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল, রাজম আয়ার (প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম সম্পাদক), নাঞ্জুন্ড রাও, মণ্ডপম শ্রীনিবাসাচার্য, এম পি তিরুমালাচার্য, অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার, ত্যাগী সুব্রহ্মণ্য শিব, পি আর সুন্দর আয়ার প্রমুখ। এঁদের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভারতীকে নিয়ে এল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর—শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদ, মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম অধ্যক্ষ শশী মহারাজের পদপ্রান্তে। তিনি তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলেন।

সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রকৃত ভক্ত করে তোলার দায়িত্ব নিলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল। সহ সম্পাদকের কাজে তাঁর নিজস্ব প্রতিভার স্ফুরণের সুযোগ ছিল না, তাই এর অতিরিক্ত 'চক্রবর্তী' নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনার ভারও গ্রহণ করলেন ভারতী। একাজের সুবাদে পরিচয় হল মহেশকুমার শর্মার সঙ্গে, যিনি স্বামীজীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সুপণ্ডিত শর্মা বাংলার সংস্কৃতিকে তামিল ভাষাভাষীর সান্নিধ্যে নিয়ে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান মহেশ তামিল ভাষায় এই মহামানবদ্বয়ের জীবনী রচনা করেছিলেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের তামিল ভাষান্তরও মহেশ করেছিলেন। তার অন্তর্গত বিখ্যাত সংগীত 'বন্দেমাতরম্' মহেশের জন্য অনুবাদ করে দেন ভারতী। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণীর আলোচনা ও চর্চার মধ্য দিয়ে উভয়ের বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের ভিত আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ভারতীকে প্রকৃত বেদান্তবাদীতে ও স্বামী বিবেকানন্দের রচনা তাঁকে খাঁটি দেশপ্রেমিকে পরিণত করে। তাঁর মনে হয় 'দেশভক্তি' দেবভক্তিরই একটি অঙ্গ। এই একই বিশ্বাসে ভারতীর রাজনীতি দেশভক্তিরই জ্বলন্ত প্রকাশরূপে দেখা দিয়েছিল। বহু রচনায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে 'স্বামী বিবেকানন্দের নির্মাতা' ও স্বামী বিবেকানন্দকে 'আধুনিক ভারতের সর্বপ্রথম নির্মাতা'রূপে অভিহিত করেছেন।

সুব্রহ্মণ্য ভারতী

ভারতীর সংবেদনশীল প্রতিভাময় সত্তায় এখন দেশপ্রেমের আগুন জ্বলে উঠল। অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত নিপীড়িত, দরিদ্র দেশবাসীর জন্য সহানুভূতিতে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেন। বালগঙ্গাধর তিলককে তিনি রাজনৈতিক গুরুর আসন দিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ সমগ্র দেশবাসীকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। বেনারসে সর্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন ভারতী, ফেরার পথে তিনি সাক্ষাৎ করলেন স্বামীজীর মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে। ভারতের জাতীয়তাবাদী ভাবধারার 'অগ্নিকন্যা' ও গুরু বিবেকানন্দের মানবজাতির উদ্দেশে প্রদত্ত সর্বজনীন বার্তার প্রাণিত-প্রচারক নিবেদিতার সঙ্গে ভারতীর এই সাক্ষাতের সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যায় ভারতীর পরবর্তী জীবনে ও সাহিত্যচর্চায়। প্রথম সাক্ষাতেই বিদেশি শাসন ও বিদেশি সংস্কৃতি নিয়ে তাঁদের আলাপ শুরু হয়। কথাপ্রসঙ্গে ভারতী ভগিনীকে যখন বললেন, ''যদিও আপনি স্বামীজীর শিষ্যা, কিন্তু জন্মসূত্রে বিদেশিনী'' (অর্থাৎ ভারতীয় সমস্যার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন না—এমন

ইঙ্গিত হয়তো ছিল), সাধারণত গরম মেজাজের হলেও নিবেদিতা এক্ষেত্রে রেগে যাননি, তিনি ভারতীর চিন্তাধারাটি ধরতে পেরেছিলেন এবং শান্তস্বরে বলেছিলেন, ''জাতপাত ও ধর্মের এই সংকীর্ণ ভাবনা এবং সমস্ত বিভেদমূলক প্রবণতা মন থেকে মুছে ফেলুন।'' নিবেদিতার শক্তিগর্ভ উপদেশ তৎক্ষণাৎ ভারতীর চোখ খুলে দেয়। তিনি নিবেদিতাকে গুরুপদে বরণ করে নেন এবং তিনটি কর্তব্যের শপথ গ্রহণ করেন : ১। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ২। জাতিভেদপ্রথা দূরীকরণ ও ৩। নারীজাগরণের মাধ্যমে নারীস্বাধীনতার চেষ্টা।

ভগিনীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তিনি এতদূর মুগ্ধ হন যে, তাঁর দেশপ্রেমের উপর আধারিত কবিতাসংগ্রহের প্রথম দুটি খণ্ড তিনি পরম শ্রদ্ধায় ভগিনীকে উৎসর্গ করেন (১৯০৮ সালে 'স্বদেশগীতাঙ্গল' ও ১৯০৯ সালে 'জন্মভূমি')। আজীবন তিনি নিবেদিতাকে স্মরণ করে বলতেন, ''নিবেদিতা মানবীরূপে এক মহাশক্তি।'' 'নিবেদিতা দেবী' কবিতার মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভারতীর হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে :

''Nivedita, Mother,
Temple consecrated to love,
Sun dispelling my soul's darkness,
Rain to the parched land of our lives,
Helper of the helpless and loss,
Offering to grace,
O you divine spark of Truth,
My salutations to you.''

নিবেদিতার নামে উৎসর্গীকৃত বইয়ের ভূমিকায় ভারতী লিখেছেন, ''Who without words, in a split second, taught me the nature of true service to the Mother and the greatness of sacrifice.''

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপজ্জনক, পরিশ্রমসাধ্য ও অনিশ্চিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে ফেললেন ভারতী। 'স্বদেশমিত্রম্'-এর 'নরমপন্থা'র বাঁধাবাঁধিতে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারছিলেন না তিনি। ইতিমধ্যে ১৯০৬ থেকে তিরুমুলাচারিয়ার ও শ্রীনিবাসাচারিয়ার এই দেশপ্রেমিক ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছে তামিল সাপ্তাহিক 'ভারত'। দুজনেই স্বামীজীর একনিষ্ঠ অনুরাগী—স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিজেদের সবটুকু সামর্থ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। ভারতী 'ভারত' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন, এখানে পেলেন তাঁর ভাষার অগ্নিবর্ষণের মঞ্চ।

২৯ জুন ১৯০৬ স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে করে তুতিকোরিন বন্দরে নামলেন এবং তামিলনাড়ুর বিভিন্ন শহর পরিদর্শন করে অবশেষে ১৫ জুলাই মাদ্রাজে এলেন। মাদ্রাজে তিনি প্রায় এক মাস ছিলেন; ওই সময়ে ভারতী অনেকবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'ভারত' পত্রিকায় অভেদানন্দজীর মাদ্রাজ তথা তামিলনাড়ুতে বসবাসকালীন সমস্ত কাজকর্মের বিবরণ প্রকাশ করতেন ভারতী। স্বদেশে ও বিদেশে প্রদত্ত তাঁর বিভিন্ন ভাষণের তামিল অনুবাদ প্রকাশ করার অনুমতিও তিনি পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্তবাণীর প্রচারক হিসাবে স্বামী অভেদানন্দের অবদানের উপর ভারতী একটি দীর্ঘ কবিতাও রচনা করেন। এদিকে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীর তেজস্বী প্রকৃতি চরমপন্থী কংগ্রেসের সমর্থনে সায় দিয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গল্প ও উপমা ব্যবহার করতেন। এমন একটি রাজনৈতিক ব্যঙ্গের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—''এক বছর বৃষ্টি না হওয়ায় চাষীরা উদ্বিগ্ন হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পরামর্শ নিতে এসে

জানাল যে, পঞ্জিকায় এ-বছর স্বাভাবিক মাত্রায় বৃষ্টি হবে বলে লেখা আছে, অথচ তা হল না, এখন কী করা যায়! শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাট্টা করে তাদের বললেন, পঞ্জিকা নিংড়ে জল বের করে নিতে। ঠিক সেইভাবেই নরমপন্থীরা মনে করেন, তাঁদের ভাষণই আমাদের দেশ স্বাধীন করার পক্ষে যথেষ্ট।" [শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত মূল কথাটি হল—পঞ্জিকায় লেখা আছে বিশ আড়া জল, কিন্তু নিংড়োলে এক ফোঁটাও পড়ে না।]

ভারতীর ঝলসে ওঠা কলমের ক্ষমতার গুণগ্রাহী ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষের ব্যক্তিরাও। চরমপন্থী আন্দোলনের উপর নেমে এল ব্রিটিশ সরকারের খড়্গ। চিদাম্বরম পিল্লাই ও অরবিন্দ ঘোষ কারারুদ্ধ হলেন, তিলককে পাঠানো হল বর্মা জেলে। সংবাদপত্রগুলিও ছাড় পেল না, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বন্দে মাতরম্' ও মাদ্রাজের 'ভারত' ব্রিটিশের কোপদৃষ্টিতে পড়ল। ভারতীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার ওয়ারেন্ট জারি করলে বন্ধুদের পরামর্শে তিনি পণ্ডিচেরি পালিয়ে গেলেন (১৯০৮)। পণ্ডিচেরিতে ফরাসি শাসন বলবৎ, ফলে ইংরেজ সরকারের ওয়ারেন্টের তোয়াক্কা না করে পণ্ডিচেরি থেকেই 'ভারত' ছাপা হয়ে বেরোতে লাগল। কিন্তু ১৯১০ সালের মধ্যে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এই পত্রিকা মুদ্রণ ও প্রচার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। পণ্ডিচেরিতে প্রতিভাধর ভারতী আরম্ভ করে দেন আরও কয়েকটি পত্রিকার কাজ—তামিল দৈনিক 'বিজয়', তামিল সাপ্তাহিক 'সূর্যোদয়', ইংরেজি সাপ্তাহিক 'বাল ভারতী' ও ইংরেজি মাসিক 'কর্মযোগী'। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহভাজন তালিকায় নাম ওঠার ফলে ১৯১০ সালের শেষাশেষি এগুলিও ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীর জীবনের এক কঠিন অধ্যায় শুরু হয়। তবু তিনি সাহসের সঙ্গে সমস্যার মোকাবিলা করে যেতে থাকেন, এমনকী অনাহারে মরতে হলেও তাঁর বেদান্তনিষ্ঠ মন আদর্শে স্থির থাকার জন্য তাঁকে প্রাণিত করে চলে। আরও কয়েকজন বিপ্লবী সেই সময় পালিয়ে গিয়ে পণ্ডিচেরিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরাই ভারতীর একমাত্র জুড়োবার জায়গা ছিলেন।

১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরিতে এলেন। এক দীর্ঘ তপস্যার জন্য তাঁর মনপ্রাণ উন্মুখ হয়েছিল। ভারতী ও অন্যান্য বিপ্লবীরা তাঁকে বন্দরে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন। বিপ্লবীরা সকলেই অরবিন্দকে রাজনীতিতে ফেরাতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। এক নির্জন গুহায় যোগসাধনার মানসে তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসনে প্রবেশ করলেন। এই সময় দীর্ঘ আট বছর ভারতী (১৯১০-১৯১৮) অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাসের সৌভাগ্য লাভ করে তাঁর তপস্যালব্ধ অনুভূতির প্রসাদও পেয়েছিলেন। ভারতীর জীবনের এই আট বছর দারিদ্র্য, কঠোর জীবনসমস্যার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল; তার সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন বেদান্ত ও শাক্তধর্মের গভীর অধ্যয়ন ও অনুধ্যানে। কাব্যরচনাকে তিনি যোগসাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করতেন। দুঃখকষ্টের এই দিনগুলিতেও তিনি স্বামীজীর জন্মতিথি উদ্‌যাপন করতে কখনও ভোলেননি। ভক্তিমূলক ও বেদান্ত বিষয়ক কাব্যরচনার মাধ্যমে তাঁর অন্তরের অর্ঘ্য স্বামীজীকে নিবেদন করতেন। শিশুদের স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প শোনাতে ভালবাসতেন।

ভারতী ছিলেন কবি, শক্তিশালী প্রাবন্ধিক, গল্পকার, দেশপ্রেমিক ও সাধক। তাঁর গদ্য-কাব্য 'শক্তি'র সূচনায় তিনি লিখেছেন—

"ঋষি রামকৃষ্ণ বলেছেন
মাটিতে বেড়া দেওয়া যায়
আকাশে কি বেড়া দিতে পার?
জড়-র উপর জোর খাটানো যায়
শক্তির নাগাল কি পেতে পার?

দেহকে বাগে আনা সামর্থ্যে কুলায়,
দেহের মধ্যে জীবনকে কি বেঁধে রাখা যায়?
জীবনযাপন বশে আনা সহজ সযতনে,
মনটাকে কি বশে আনতে তেমন করে পার?
প্রাণের মাঝে শক্তি আছে, আছে যে তা মনে,
ধরতে তাকে মন্দির তার হৃদমাঝারে গড়ো।"

তাঁর শক্তি-উপাসনার আকুতি ঝরে পড়েছে আর-একটি ছোট কবিতায়—

"হে মাতা!
তোমার আশিসে যেন লক্ষ্য প্রাপ্ত হই
তোমার আশিসে সদ্‌গুণে পূর্ণ হই!
দাও মোরে মহতী বিশ্বাস
লক্ষ্যে যেন হই অবিচল
দাও মোরে জ্ঞান ও বিবেক আহরণে বল!
তোমার ভক্তিতে যেন দূর হয় মোর সব পাপ
উবে যায় শিশির কণিকা পেয়ে সূর্যের উত্তাপ!"

ভারতী মনেপ্রাণে বেদান্তবাদী, তাই তাঁর শক্তি-উপাসনা কখনও বেদান্তের মূল আদর্শকে লঙ্ঘন করেনি। 'নবশক্তিমার্গম্'-এ তিনি শক্তিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথার প্রতিধ্বনি—

"যদিও সাধারণের মধ্যে শক্তি-উপাসনা বহুল প্রচলিত, কিন্তু তারা শক্তিতত্ত্ব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যারা কেবল মূর্তি, পট ও পুঁথির পূজা করে, যারা এদের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করে না, ঈশ্বর তাদের কৃপা করেন না। পরাশক্তি ও পরমাত্মা অভেদ। পরমাত্মাই শক্তিরূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করছেন। তাই শাক্তগণ ঈশ্বরের পুরুষ-রূপ বা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা না করে ঈশ্বরের স্ত্রীরূপ অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন 'লোকমাতা' রূপে। রামকৃষ্ণ পরমহংস কথাবার্তার সময় সর্বদা 'আমার মা কালী' বলতেন। সাধকের 'লোকমাতা' উপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য জানা উচিত। 'নবশক্তি' নতুন কিছু নয়, এই শক্তিমার্গম্-এর অর্থ হল শক্তিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণ অর্থ বোধ করে শক্তি উপাসনা।"

যাঁরা কেবল ভাগ্য ও কর্মফলের দোহাই দেন, সেই সমস্ত নিষ্কর্মা দার্শনিকদের ভারতী ধিক্কার দিয়ে বলেছেন, "রামকৃষ্ণ সর্বদা জপ করতেন, আমি নই, তুমি তুমি। তাঁকে কি নিষ্কর্মা মনে কর? আহা! আহা! তিনি বিবেকানন্দকে সৃষ্টি করেছেন! আর বিবেকানন্দ গড়েছেন আধুনিক ভারত!"

তাঁর লেখা বহু গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের মূল ভাব প্রচ্ছন্ন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, বড় গল্প 'চান্দ্রী কাঈ কথাঈ'-তে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্মুক্ত অবস্থাটি বর্ণিত হয়েছে : বিশালাক্ষী বললেন, "আমি বিশ্বাস করি না, এই সংসারে কেউ জীবন্মুক্ত থাকতে পারেন। তুমি কি এমন কাউকে দেখেছ?"

সোমনাথাইয়ার বলে উঠলেন, "আমি একজনের কথা জানি, যিনি জীবন্মুক্ত, তিনি হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস।"

'চক্রবর্তিনী' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে সুমধুর ভাষায় সুব্রহ্মণ্য ভারতী স্বামীজী সম্বন্ধে লিখেছেন 'শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংস', অপূর্ব বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন কীভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ তরুণ নরেন্দ্রনাথের জীবন পরিবর্তন করে তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে প্রস্ফুটিত করলেন, সেই বিবরণ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা ও আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রভাব ভারতীর রচনার সর্বত্র স্পষ্ট। যদিও স্বামীজীর আমিষ আহার নিয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন ছিল, কিন্তু সামাজিক সংস্কার নীতির ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বামীজীর ভাবধারা সমর্থন করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মীয় উদারতার দ্বারা তিনি যে অত্যধিক প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ যিশুখ্রিস্ট ও আল্লাহকে নিয়ে সংগীত রচনা। তাঁর রচনা সেকালে যুবা থেকে বৃদ্ধ সকলকে প্রভাবিত করেছিল। শক্তিতত্ত্বের গভীর অনুধ্যানের ফলে তাঁর মানসিক শক্তি অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও

অপ্রতিহত ছিল। তাঁর স্থানে অন্য কেউ থাকলে হয়তো ওই কঠোর দারিদ্র্য ও বিপদের দিনে আত্মহত্যার চিন্তা করতেন।

যাইহোক, সুদীর্ঘ দশ বছর স্বেচ্ছা নির্বাসনে পণ্ডিচেরিতে থাকার পর ২০ নভেম্বর ১৯১৮ তিনি মাদ্রাজে ফিরে আসেন। তখন তাঁর সক্রিয় রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চার আগ্রহেও ভাঁটা পড়েছে। কঠোর দারিদ্র্য, সাধনা ও অন্তর্মুখ জীবন তাঁকে এক উপলব্ধিবান সাধকে পরিণত করেছে। মাদ্রাজ প্রবেশের মুখেই তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বন্দি হলেন; ভাগ্যক্রমে রামস্বামী আয়ার ও অ্যানি বেসান্তের হস্তক্ষেপে চার দিন পরে ছাড়াও পেয়ে গেলেন। আরও দুবছর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম চলল স্ত্রী চেল্লাম্মাল-এর জন্মস্থান, তিরুনেলভেলি জেলার কাড়ায়ামে। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হতেন তিনি। তাঁর চৌম্বক ব্যক্তিত্ব ও ভাষণ বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করত।

এই সময়ে একদিন স্থানীয় পার্থসারথি মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে অভ্যাসমতো হাতিকে নারকেল নিবেদন করেছেন; হাতিটা হয়তো উত্তেজিত ছিল, শুঁড় দিয়ে ভারতীকে অতর্কিত আঘাত করে। তিনি অচেতন হয়ে পড়ে গেলে বন্ধুরা এসে তাঁকে উদ্ধার করে। চিকিৎসা সত্ত্বেও শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২১ তিনি মর্ত্যতনু ত্যাগ করে অমৃতলোকে যাত্রা করেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের নবনির্মিতিকালে বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষাভাষী যে-সকল ব্যক্তিত্ব শক্তিশালী কলমের দ্বারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে সুব্রহ্মণ্য ভারতী অন্যতম। 'ভারতী যুগ'-এর হাত ধরে তামিল সাহিত্যের রেনেসাঁর সূত্রপাত। তাঁর মৃত্যুর পর শতবর্ষ অতিক্রান্ত প্রায়, আজও তাঁর গান ও কবিতা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, শক্তি জোগায়।

২০১৩ সালের মার্চ মাসে SS Music ও Ayngaran International লক্ষ করে যে, বিখ্যাত ব্রিটিশ গায়ক Adele-এর রেকর্ড 'Skyfall' গানের কথা ভারতীর কবিতা 'আছামিল্লাই আছামিল্লাই'-এর (*"Uchchi Meedhu Vaan Idindhu Veezhu gindra Podhinum, Achcham Illai Achcham Illai Achcham Enbadhill-aiye")* প্রায় অনুবাদ বলা চলে—'Let the sky fall, when it crumbles, we will stand tall and face it all together.' বিশ্বমানসের প্রেক্ষিতে ভারতীর চিন্তার প্রভাব কতদূর কার্যকরী, এই গানের বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে তার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

ভারতী, কুভেম্পু, আসান—এঁদের সুন্দর জীবন ও সাহিত্যচর্চার অনুধ্যান আজকের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সাহিত্যিকদের প্রেরণা জোগাবে, সন্দেহ নেই। ✠ *সমাপ্ত*

সহায়ক গ্রন্থ

১। G. Venkataraman Reddy, *Poet Subramanya Bharati and Rama-krishna Vivekananda Movement* (*Prabuddha Bharata*, June 1987)

২। Sankari Prasad Basu, *Vivekananda and Social Movement in Kerala* (*Prabuddha Bharata*, Jan-Feb 1989)

৩। Swami Siddhinathananda, *RAMA-KRISHNA VIVEKANADA IN KERALA*, from the souvenir *Viveka Tarangam* (First All Kerala Ramakrishna Vivekananda Bhakta Sammelan, 2001)

৪। Prof. S. Radhakrishnan, *Swami Vivekananda and Kerala*, (Vivekananda Kendra Prakashan Trust, Chennai-5)

৫। Writersinmalayalam.blogspot.com